Syllabus For BCS (Written) Examination
Bangladesh Affairs -2 (Compulsory)
Subject Code: 005

Chapter	Topic	Page
04	Economy, society, literature and culture of Bangladesh with particular emphasis on developments including Poverty Alleviation	126
	GNP, NNP, GDP etc. after the emergence of the country.	127
07	**The Constitution of the People's Republic of Bangladesh**	
	Preamble	08
	Features	07
	Directive Principles of State Policy	11
	Constitutional Amendments	20
08	**Organs of the Government**	
	Legislature	61
	Representation, Financial and Oversight functions	61
	Rules of Procedure	62
	Law-making	64
	Gender Issues, Caucuses, Parliament Secretariat	68
	Executive	39
	Chief and Real executive e.g. President and Prime Minister, Cabinet	39
	Powers and Functions, Council of Ministers, Bureaucracy, Secretariat	51
	Rules of Business, Law enforcing agencies	58
	Administrative setup- National and Local Government structures	44
	Decentralization Programmes and Local Level Planning	55
	Judiciary	69
	Structure: Supreme, High and other Subordinate Courts, Organization, Powers and functions of the Supreme Court, Organization of Sub-ordinate Courts	70
	Appointment, Tenure and Removal of Judges; Judicial Review, Adjudication	74
	Separation of Judiciary from the Executive	76
	Gram Adalat, Alternative Dispute Resolution (ADR)	79

Chapter	Topic	Page
09	**Foreign Policy and External Relations of Bangladesh**	
	Goals	215
	Determinants and policy formulation process	216
	Factors of national power, security strategies	223
	Geo-politics and environment issues	220
	Economic diplomacy, Man-power exploitation	221
	Participation in international organizations, UNO and UN peace keeping missions	237
	NAM, SAARC, OIC, BIMSTEC, D-8 etc	241
10	**Political Parties**	
	Historical development	85
	Leadership	96
	Social bases; structure	90
	Ideology and programmes, factionalism	89
	Inter and intra-party relations, politics of alliances, electoral behaviour	91
	Parties in Government and Opposition	91
11	**Elections in Bangladesh**	
	Management of electoral politics	107
	Role of the Election Commission	109
	Electoral Law	115
	Representation of People's Order (RPO)	115
	Election observation teams	117
13	**Non-formal Institutions**	
	Role of Civil Society	98
	Interest Groups	94
	NGOs in Bangladesh	101
14	Globalization and Bangladesh	200
	Economic and Political Dimensions	203
	Roles of the WTO, World Bank, IMF, ADB, IDB and other development partners, Multi National Corporations (MNCs)	201

সূচিপত্র

অনুচ্ছেদ	বিষয়	পৃষ্ঠা
	অধ্যায়-০১: বাংলাদেশের সংবিধান	
১.১	সংবিধানের পরিচয়	০৪
১.২	বাংলাদেশ সংবিধান প্রণয়নের ইতিহাস	০৫
১.৩	বাংলাদেশের সংবিধান	০৬
১.৪	সংবিধানের প্রস্তাবনা	০৮
১.৫	১ম ভাগ: প্রজাতন্ত্র	০৯
১.৬	২য় ভাগ: রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি	১১
১.৭	৩য় ভাগ: মৌলিক অধিকার	১৪
১.৮	৯ম-ক ভাগ: জরুরি বিধানাবলি	১৯
১.৯	১০ম ভাগ: সংবিধান সংশোধন	২০
১.১০	সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান ও পদ	২১
১.১১	সংবিধানের তফসিলসমূহ	২২
১.১২	সংবিধানের সংশোধনীসমূহ	২৩
	অধ্যায়-০২: বাংলাদেশ সরকারের অঙ্গসংগঠন	
২.১	রাষ্ট্র	৩৭
	নির্বাহী বিভাগ	
২.২	রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী	৩৯
২.৩	বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা	৪৪
২.৪	বাংলাদেশের প্রশাসন	৫১
২.৫	প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস ও সংস্কার	৫৪
২.৬	নির্বাহী বিভাগের জবাবদিহিতা	৫৮
	আইন বিভাগ	
২.৭	বাংলাদেশের আইনসভা: জাতীয় সংসদ	৬১
	বিচার বিভাগ	
২.৮	বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থা	৬৯
২.৯	বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্ট	৭০
২.১০	বিচার বিভাগের স্বাধীনতা	৭৪
২.১১	অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ আইন ও বিধি	৮০
	অধ্যায়-০৩: গণতন্ত্র, রাজনীতি ও অনানুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠান	
৩.১	গণতন্ত্র	৮৫
৩.২	রাজনৈতিক দল	৮৭
৩.৩	সরকার ও বিরোধী দল সম্পর্ক	৯১
৩.৪	চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী	৯৪
৩.৫	নেতৃত্ব	৯৬
৩.৬	আমলাতন্ত্র	৯৭
৩.৭	সুশীল সমাজ	৯৮
৩.৮	বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা	১০১

অনুচ্ছেদ	বিষয়	পৃষ্ঠা
	অধ্যায়-০৪: বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থা	
৪.১	নির্বাচন ব্যবস্থা	১০৭
৪.২	নির্বাচন কমিশনের গঠন ও দায়িত্ব	১০৯
৪.৩	বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের নির্বাচন	১১১
৪.৪	নির্বাচনি আচরণবিধি	১১৫
৪.৫	পর্যবেক্ষকের ভূমিকা	১১৭
৪.৬	সুষ্ঠু নির্বাচনে সরকার, নাগরিক ও নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা	১১৯
	অধ্যায়-০৫: অর্থনীতি ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনা	
৫.১	অর্থনৈতিক ব্যবস্থা	১২৬
৫.২	অর্থায়ন	১৩৩
৫.৩	বাজেট	১৩৬
৫.৪	বাংলাদেশের অর্থনীতির গতিধারা	১৩৭
৫.৫	বাংলাদেশের আর্থিক ব্যবস্থাপনা	১৪১
৫.৬	উন্নয়ন পরিকল্পনা	১৪৩
৫.৭	মেগা প্রকল্প	১৪৬
	অধ্যায়-০৬: অর্থনৈতিক খাত	
৬.১	বাংলাদেশের কৃষিখাত	১৫৫
৬.২	বাংলাদেশের শিল্পখাত	১৬৩
৬.৩	বাংলাদেশের সেবাখাত	১৭৯
	অধ্যায়-০৭: বাণিজ্য ও বিশ্বায়ন	
৭.১	বাণিজ্য	১৮৪
৭.২	বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্য	১৮৫
৭.৩	বাংলাদেশের বাণিজ্য উন্নয়ন	১৮৮
৭.৪	বৈদেশিক সাহায্য ও বিনিয়োগ	১৯৪
৭.৫	বিশ্বায়ন	২০০
৭.৬	শঙ্কা ও সম্ভাবনার অর্থনীতি	২০৩
	অধ্যায়-০৮: বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সম্পর্ক	
৮.১	পররাষ্ট্রনীতি	২১২
৮.২	বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি	২১৫
৮.৩	ভূ-রাজনীতি	২২০
৮.৪	দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক	২২৩
৮.৫	আন্তর্জাতিক সংস্থায় বাংলাদেশ	২৩৭
৮.৬	আঞ্চলিক সংস্থায় বাংলাদেশ	২৪১
	মডেল টেস্ট	
	মডেল টেস্ট (০১-০৪)	২৪৭

বিগত সালের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্ন বিশ্লেষণ
বাংলাদেশ বিষয়াবলি ২য় খণ্ড

অধ্যায়	বিষয়	৫০তম	৪৭তম	৪৬তম	৪৫তম	৪৪তম	৪৩তম	৪১তম	৪০তম	৩৮তম	৩৭তম	৩৬তম	৩৫তম	মোট
১	বাংলাদেশের সংবিধান	৩	১	-	১	৩	১	২	৩	১	১	১০	৩	২৯
২	বাংলাদেশ সরকারের অঙ্গসংগঠন	১	-	-	-	-	২	১	২	৩	২	৪	৭	২২
৩	গণতন্ত্র, রাজনীতি ও অনানুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠান	১	১	-	-	-	-	৪	-	-	২	-	৩	১১
৪	বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থা	-	-	-	-	-	৩	৩	-	-	২	৪	২	১৪
৫	অর্থনীতি ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনা	১	-	২	৩	৫	৫	-	১	-	-	৫	১	২৩
৬	অর্থনৈতিক খাত	-	২	২	১	-	১	১	২	১	-	-	২	১২
৭	বাণিজ্য ও বিশ্বায়ন	১	-	-	-	-	১	-	২	-	২	-	১	০৭
৮	বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সম্পর্ক	১	১	২	২	-	২	৪	-	৩	২	২	৬	২৫
	মোট প্রশ্নের সংখ্যা	০৮	০৫	০৬	০৭	০৮	১৫	১৫	১০	০৮	১১	২৫	২৫	১৪৩

অধ্যায় ০১ বাংলাদেশের সংবিধান

বিগত সালের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্ন

০১। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে বর্ণিত মৌলিক অধিকারসমূহ বাস্তবায়নে নাগরিকগণ কী ধরনের প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়ে থাকেন? এ সকল প্রতিবন্ধকতা কীভাবে নিরসন করা যেতে পারে? [৫০তম বিসিএস]

০২। চিন্তা, বিবেক, বাক্‌স্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সম্পর্কিত বাংলাদেশের সাংবিধানিক বিধান ও এ সকল অধিকার অর্জনে বিগত ৫৪ বছরে নাগরিকদের অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ করুন। [৪৭তম বিসিএস]

০৩। সংবিধানের প্রস্তাবনা এবং এর গুরুত্ব সম্পর্কে কী জানেন? বাংলাদেশের সংবিধানে পঞ্চদশ সংশোধনীর ফলে যেসব পরিবর্তন এসেছে সেগুলো প্রভাবসহ আলোচনা করুন। [৪৫তম বিসিএস]

০৪। (ক) 'সংবিধানই বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আইন'-ব্যাখ্যা করুন। [৪৪তম বিসিএস]
(খ) সংবিধান সংশোধনের প্রক্রিয়া সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদ উল্লেখপূর্বক বর্ণনা করুন। [৪৪তম বিসিএস]
(গ) সংবিধান অনুসারে হাইকোর্টের একজন বিচারপতিকে অপসারণের প্রক্রিয়া আলোচনা করুন। [৪৪তম বিসিএস]

০৫। বাংলাদেশের সংবিধানে বর্ণিত রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিসমূহ কী কী? [৪৩তম বিসিএস]

০৬। (ক) 'সংবিধান' কাকে বলে? বাংলাদেশের সংবিধান প্রথম কবে চালু হয়? এর মূলনীতিসমূহ সংক্ষেপে আলোচনা করুন। [৪১তম বিসিএস]
(খ) বর্তমানে বাংলাদেশের সংবিধানের কোন ভার্শনটি অনুসরণ করা হয়? এর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন। [৪১তম বিসিএস]

০৭। বাংলাদেশ সংবিধানের মূলনীতিগুলো বর্ণনা করুন। [৪০তম, ৩৩তম বিসিএস]

০৮। বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধনের বিধানাবলি বর্ণনা করুন। [৪০তম বিসিএস]

০৯। বাংলাদেশের সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মূল বিষয়গুলো বর্ণনা করুন। [৪০তম বিসিএস]

১০। সংবিধানের সংজ্ঞা দিন। বাংলাদেশের সংবিধানে কতটি অনুচ্ছেদ রয়েছে? [৩৮তম, ৩৩তম বিসিএস]

১১। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে বর্ণিত রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি সমূহের বিবরণ দিন। [৩৭তম বিসিএস]

১২। (ক) বাংলাদেশের ১৯৭২ সালের সংবিধানের রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিগুলি কী কী? [৩৬তম বিসিএস]
(খ) বাংলাদেশের সংবিধান অনুসারে জনগণের মৌলিক অধিকারসমূহ কী কী? [৩৬তম বিসিএস]
(গ) বাংলাদেশের সংবিধানের উল্লিখিত নারীর অধিকারগুলো লিখুন। [৩৬তম বিসিএস]
(ঘ) 'প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ' বাংলাদেশের সংবিধান অনুসারে সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদ অনুসারে ব্যাখ্যা করুন। [৩৬তম, ২৮তম বিসিএস]

১৩। সাংবিধানিক পদ বলতে কী বুঝায়? বাংলাদেশে ৫টি সাংবিধানিক পদের নাম ও সংক্ষেপে দায়িত্ব লিখুন। [৩৬তম বিসিএস]

১৪। বাংলাদেশের সংবিধানের নিম্নলিখিত সংশোধনীগুলির রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ও গুরুত্ব বর্ণনা করুন। [৩৬তম বিসিএস]
(ক) বাংলাদেশের সংবিধানের ৫ম সংশোধনী। (খ) বাংলাদেশের সংবিধানের ১২ তম সংশোধনী।
(গ) বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫ তম সংশোধনী। (ঘ) বাংলাদেশের সংবিধানের ১৬ তম সংশোধনী।

১৫। (ক) বাংলাদেশ সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষতা সংক্রান্ত ১২ ধারাটি লিখুন। [৩৫তম বিসিএস]
(খ) বাংলাদেশের সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর পাঁচটি দিক উল্লেখ করুন। [৩৫তম বিসিএস]
(গ) সংসদীয় সরকার কীভাবে গঠিত হয়? [৩৫তম বিসিএস]

১৬। সংবিধানের রাষ্ট্রধর্ম সম্পর্কিত বিধান কী? [৩৪তম বিসিএস]

১৭। সংবিধানের প্রাধান্য বলতে কী বুঝায় তা অনুচ্ছেদ উল্লেখপূর্বক বর্ণনা করুন। [৩৪তম বিসিএস]

১৮। সংবিধানে রাষ্ট্রের মৌলিক দায়িত্ব হিসাবে নাগরিকদের জন্য কী কী বিষয়সমূহ অর্জন নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে? [৩৪তম বিসিএস]

১৯। চলাফেরার ও সমাবেশের স্বাধীনতা সম্পর্কিত সংবিধানের বিধানদ্বয় কী কী এবং তা কোন কোন অনুচ্ছেদে রয়েছে? [৩৪তম বিসিএস]

২০। জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হওয়ার যোগ্যতা ও অযোগ্যতা উল্লেখ করুন। [৩৪তম বিসিএস]

২১। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান কোন সালের কোন তারিখ হতে কার্যকর হয়? এতে বিধৃত মৌলিক অধিকারসমূহ বর্ণনা করুন এবং কী পরিস্থিতিতে এবং কোন অনুচ্ছেদ অনুযায়ী মৌলিক অধিকার সাময়িকভাবে স্থগিত করা হয়? [৩৪তম, ২৯তম বিসিএস]

নমুনা লিখিত প্রশ্ন

০১। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা কী? বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার স্বরূপ এবং গুরুত্ব আলোচনা করুন।
০২। সংবিধানের ৭০ নং অনুচ্ছেদ কী? সংস্কার কমিশনের সুপারিশের আলোকে ৭০ নং অনুচ্ছেদ সংস্কারের পক্ষে-বিপক্ষে মতামত দিন। সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন রাখার যৌক্তিকতা আলোচনা করুন।
০৩। রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ প্রণয়ন সম্পর্কিত ক্ষমতা কি? রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও কার্যাবলি সম্পর্কে আলোচনা করুন।
০৪। বিকেন্দ্রীকরণ কি? বিকেন্দ্রীকরণের গুরুত্ব ও তাৎপর্য এর আলোকে বিকেন্দ্রীকরণ এর পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি দিন।
০৫। রাষ্ট্র পরিচালনায় রাষ্ট্রের প্রধান অঙ্গসমূহের ভূমিকা আলোচনা করুন। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে স্থানীয় সরকারের সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত? আলোচনা করুন।
০৬। স্থানীয় শাসন ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের পার্থক্য কী কী?
০৭। স্থানীয় শাসনের ক্ষুদ্রতম ইউনিট কোনটি? এর মৌলিক সুবিধা ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে মতামত উপস্থাপন করুন।
০৮। বাংলাদেশের আইন প্রণয়ন পদ্ধতির পর্যায়ক্রমিক ধাপসমূহ উল্লেখ করুন।
০৯। বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ সম্পর্কে সাংবিধানিক দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তবে প্রতিপালিত হচ্ছে কি? আপনার মতামত লিখুন।
১০। বাংলাদেশের প্রশাসন ব্যবস্থাকে আরো গতিশীল করার জন্য করণীয় কী?
১১। রাষ্ট্র পরিচালনায় এর তিন বিভাগের সমন্বয়ের গুরুত্ব আলোচনা করুন।

নমুনা লিখিত প্রশ্নোত্তর

০১. প্রশাসনের বিকেন্দ্রীকরণের পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তিসমূহ বিশ্লেষণ করে নির্বাহী বিভাগের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে সরকারের গৃহীত উদ্যোগসমূহ আলোচনা করুন। ২০

প্রশাসনের উর্ধ্বতন পর্যায় থেকে নিম্নতম পর্যায়ে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়াকে বিকেন্দ্রীকরণ বলা হয়ে থাকে। অন্যকথায় প্রশাসনিক সংগঠনের সকল কার্য এবং দায়িত্ব কোনো কেন্দ্রীয় সংস্থায় নিয়োজিত না থেকে অধস্তন সংস্থাসমূহে বা কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করা হয় তাকে বিকেন্দ্রীকরণ বলা হয়। বিকেন্দ্রীভূত প্রশাসনে বিভিন্ন দপ্তর ও অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে থাকেন। তবে তাদের জবাবদিহিতা ও দায়িত্বশীলতা থাকে। বিকেন্দ্রীকরণের বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ:

- সংগঠনের সকল স্তরে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা অর্পণ
- অধস্তন কর্মীদের কার্যকারিতা ও গুরুত্ব বৃদ্ধি
- এটি উর্ধ্বতন ও অধস্তন কর্মীদের সমন্বিত করার একটি প্রক্রিয়া
- এ প্রক্রিয়ায় সিদ্ধান্ত গ্রহণে সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়
- বিকেন্দ্রীকরণে কর্মকেন্দ্রিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা হয়।

বিকেন্দ্রীকরণের পক্ষে যুক্তি

বিকেন্দ্রীকৃত প্রশাসন ব্যবস্থায় বিভিন্ন স্তরে প্রশাসনিক নেতৃত্ব গড়ে ওঠার সম্ভাবনা বেশি। কেননা, বিকেন্দ্রীকরণ প্রশাসনে জনগণের পক্ষে অংশগ্রহণের সুযোগ থাকে বেশি। এইরূপ প্রশাসনে স্থানীয় সমস্যাকে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয় বলে তা সমাধান করার সম্ভাবনাও থাকে বেশি। নিম্নে বিকেন্দ্রীকরণের পক্ষে যুক্তি আলোচনা করা হলো-

- **জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়:** বিকেন্দ্রীকরণের ফলে প্রশাসনে জনগণের অংশগ্রহণ এবং নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত হয়। বিকেন্দ্রিক প্রশাসনে জনগণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্বাধীনভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে। এর ফলে নিজেদেরকে প্রশাসনের অংশ মনে করে।
- **গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব অনুশীলন বৃদ্ধি:** এ প্রক্রিয়ায় অধস্তন কর্মীদেরকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়া হয়। সিদ্ধান্তগ্রহণে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়। দায়িত্বের পাশাপাশি তাদেরকে সমপরিমাণ কর্তৃত্বও প্রদান করা হয়।
- **নির্বাহীদের কার্যভার লাঘব:** বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা উচ্চ পর্যায়ের নির্বাহীদের হাতে রেখে স্বাভাবিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ, আদেশ দান, তত্ত্বাবধায়ন ক্ষমতা নিম্নস্তরের নির্বাহীদের উপর অর্পণ করা হয়।
- **কেন্দ্রীয় প্রশাসন ও আঞ্চলিক প্রশাসনের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপন:** প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের ফলে কেন্দ্রীয় প্রশাসন ও আঞ্চলিক প্রশাসনের মধ্যে সহযোগিতা ও সুসম্পর্ক বৃদ্ধি পায়। প্রশাসনে কাজের গতিশীলতা কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে থাকে।
- **লালফিতার দৌরাত্ম্য হ্রাস পায়:** প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ প্রশাসনিক এবং সাংগঠনিক কাজে অযথা বিলম্ব হ্রাস করে ও লালফিতার দৌরাত্ম্য দূর করতে সাহায্য করে। কেননা, সকল সিদ্ধান্তের জন্য কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের মুখাপেক্ষী হতে হয় না। ফলত সাংগঠনিক কাজ দ্রুত সম্পন্ন হয়।
- **প্রশাসনিক জটিলতা হ্রাস পায়:** বিকেন্দ্রীকরণ নীতির গ্রহণের ফলে প্রশাসনিক জটিলতা হ্রাস পায়। কারণ বিকেন্দ্রীকরণের ফলে কেন্দ্রের সাথে সকল বিষয়ে চিঠি, সংবাদ কিংবা মতামত আদান-প্রদান করার দরকার হয় না। ফলে সহজেই দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়।

বিকেন্দ্রীকরণের বিপক্ষে যুক্তি

বিকেন্দ্রীকরণ প্রশাসনের একটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া হিসাবে বিবেচিত হলেও এর কতগুলো বিপজ্জনক দিক রয়েছে। নিম্নে বিকেন্দ্রীকরণের বিপক্ষে যুক্তি তুলে ধরা হলো:

- **ব্যয় বৃদ্ধি:** বিকেন্দ্রীকরণের ফলে প্রশাসনে অনেকগুলো বিভাগের সৃষ্টি হয়। এসব বিভাগের দায়িত্ব প্রদানের জন্য বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ কর্মী নিয়োগ দিতে হয়। অন্যদিকে নতুন নতুন বিভাগের জন্য অফিস সরঞ্জামাদি সংগ্রহ করতে হয়। এ উভয় ক্ষেত্রেই প্রতিষ্ঠানের ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, যেটা প্রতিষ্ঠানের নিকট অনেকটা বোঝা হয়ে দাঁড়ায়।
- **প্রশাসনের ঐক্য নষ্ট হয়:** সমরূপতা এবং ঐক্য সুষ্ঠু প্রশাসনের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু বিকেন্দ্রীকরণ প্রশাসনিক ব্যবস্থার ঐক্য এবং সমরূপতা বিনষ্ট করে। ফলে জাতীয় নীতি নির্ধারণ ও তা রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়ে।
- **জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলায় ব্যর্থতা:** বিকেন্দ্রীকরণে যেহেতু সকল স্তরে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা অর্পিত থাকে, সেহেতু সকল নির্বাহী ও বিভাগের সাথে সমন্বয় এবং আলাপ-আলোচনা ছাড়া জরুরি অবস্থা মোকাবিলা করা যায় না। এতে অনেক সময়ক্ষেপণ হয় বলে জরুরি অবস্থা মোকাবিলা করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে।
- **প্রশাসনিক সমন্বয় বিঘ্ন হয়:** বিকেন্দ্রীকরণ নীতির ফলে প্রশাসনিক নিয়ম-নীতি, রীতি-নীতি, সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে নানা রকম বিভিন্নতা দেখা যায়। এর ফলে সমন্বয়ের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি হয়। অনেক সময় অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে সমন্বয়হীনতা আরও বেড়ে যায়।
- **অধস্তনদের স্বেচ্ছাচারিতা:** বিকেন্দ্রীকরণ অনেক ক্ষেত্রে কর্মচারীদের স্বেচ্ছাচারী করে তোলে। কারণ এ প্রক্রিয়ায় সংগঠনের সকল স্তরের নির্বাহীদের হাতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা থাকে বিধায় বিভিন্ন সময় তারা শীর্ষ নির্বাহীদের আদেশ নির্দেশের তোয়াক্কা না করে নিজেদের খেয়াল খুশি মতো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে। অধস্তনদের এ ধরনের মনোভাব প্রশাসনে স্বেচ্ছাচারিতার জন্ম দেয়।

নির্বাহী বিভাগের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে সরকারের গৃহীত উদ্যোগসমূহ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশর সংবিধানের ৫৫(৩) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী মন্ত্রিসভা যৌথভাবে সংসদের নিকট দায়ী থাকে। অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিপরিষদের সদস্যবৃন্দকে শাসন বিভাগের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের জন্য জাতীয় সংসদের নিকট জবাবদিহি করতে হয়। জবাবদিহিতার এই বিষয়টি বিদ্যমান থাকায় সরকারকে সদা জনগণের কল্যাণে নিয়োজিত থাকতে হয়। অনেকক্ষেত্রে, সরকারের ভুল-ত্রুটি শুধরে দিতেও জাতীয় সংসদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। শাসন বিভাগের জবাবদিহিতা হলো বিভিন্ন দপ্তরের মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রীসহ অন্যান্য কর্মকর্তারা তাঁদের উপর অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে সম্পাদন করছেন কিনা সে ব্যাপারে সংসদ বা আইন সভায় অবহিত করা। মন্ত্রী ও কর্মকর্তাদের উপর অর্পিত কার্যক্রম যদি জনগণের প্রতিকূলে যায়, সেক্ষেত্রে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ জাতীয় সংসদ করে থাকে। এভাবে জাতীয় সংসদ জাতীয় তহবিলের রক্ষক ও অভিভাবক হিসেবে কাজ করে। নির্বাহী বিভাগের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে রুলস অব বিজনেস এবং জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল নীতি প্রণীত হয়েছে। নির্বাহী বিভাগের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে সরকার বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকে। এসব উদ্যোগের মধ্যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিচে তুলে ধরা হলো-

জনগণের প্রতিক্রিয়া ও অভিযোগ গ্রহণ

জনগণের প্রতিক্রিয়া ও অভিযোগ গ্রহণের জন্য সরকার অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (GRS) গ্রহণ করেছে। সরকারের জনপ্রতিনিধি এবং এজেন্সিগুলির মাধ্যমে জনগণের অভিযোগ গ্রহণ করা হয়। জনগণের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হয়, যার মাধ্যমে সরকারি কার্যক্রমের স্বচ্ছতা বজায় থাকে।

তথ্য অধিকার আইন (Right to Information Act)

তথ্য অধিকার আইন হচ্ছে একটি শক্তিশালী উপায়, যার মাধ্যমে জনগণ সরকারি তথ্য পেতে পারে। এই আইন অনুযায়ী, জনগণ সরকারি দফতর থেকে তথ্য চেয়ে জানতে পারবে যে, সরকার কীভাবে এবং কেন সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। এতে সরকারের স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পায় এবং কর্মকর্তাদের প্রতি জনগণের জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়।

ই-গভর্নমেন্ট

সরকারের বিভিন্ন সেবা ই-গভর্নমেন্ট ব্যবস্থা দ্বারা প্রদান করা হয়, যা জনসাধারণের জন্য সহজলভ্য। এটি সরকারের কার্যক্রমের জবাবদিহিতা বাড়ায়, কারণ সব কিছু ডিজিটালি ট্র্যাক করা যায় এবং জনগণ যে কোনো মুহূর্তে সেবাগুলোর মান যাচাই করতে পারে।

দুর্নীতি বিরোধী আইন এবং ব্যবস্থা

দুর্নীতি দমন কমিশন এবং বিশেষ ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেয়া হয়। সরকারি কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ থাকলে তা তদন্ত করা হয় এবং দোষী হলে শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়।

বাজেট প্রণয়ন এবং মনিটরিং

বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। সরকারের বাজেট এবং অন্যান্য সিদ্ধান্তের প্রতিটি ধাপ পর্যবেক্ষণ করা হয় এবং জনগণের মতামত গ্রহণ করা হয়। সংসদে বাজেট পাস হওয়ার পরেও বিভিন্ন কমিটি ও সংসদ সদস্যরা তার কার্যকারিতা পর্যবেক্ষণ করে।

পার্থক্যের ক্ষেত্র	রাজনৈতিক দল	চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী
সাংগঠনিক কাঠামো	সুসংগঠিত ও কাঠামোবদ্ধ	তুলনামূলকভাবে দুর্বল ও অগঠিত
উদ্দেশ্য	রাষ্ট্রক্ষমতায় গিয়ে দলীয় নীতি বাস্তবায়ন	সরকারি সিদ্ধান্তে প্রভাব বিস্তার
কর্মপদ্ধতি	প্রকাশ্য ও প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ বা গোপন পদ্ধতিতে পরিচালিত
সমঝোতা	সমমনোভাবাপন্ন দলের সঙ্গে জোট ও সমঝোতা	সাধারণত সমঝোতার প্রবণতা কম
নির্বাচনে অংশগ্রহণ	সরাসরি নির্বাচনে অংশগ্রহণ	নির্বাচন অংশ নেয় না, কেবল প্রভাবিত করে
সিদ্ধান্তগ্রহণ	গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া অনুসরণের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণে জটিলতা সৃষ্টি হয়	দ্রুত ও সহজে সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব
অপরিহার্যতা	গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অপরিহার্য	সব রাষ্ট্রে প্রযোজ্য নয়, অনেক রাষ্ট্রে অনুপস্থিত
মতাদর্শ	মতাদর্শভিত্তিক ও মতাদর্শ রক্ষায় অঙ্গীকারবদ্ধ	সাধারণত মতাদর্শ নিরপেক্ষ, স্বার্থনির্ভর

৩.৫ নেতৃত্ব

নেতৃত্বের ধারণা

'নেতৃত্ব' (Leadership) শব্দটি এসেছে ইংরেজি 'Lead' থেকে, যার অর্থ পথ দেখানো, পরিচালনা করা ও নির্দেশ দেওয়া। সাধারণভাবে, নেতৃত্ব বলতে বোঝায় একজন নেতার সেই গুণাবলি যার মাধ্যমে তিনি অন্যদের প্রভাবিত করে তাদের একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যপথে পরিচালিত করেন। তবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে নেতৃত্ব শুধু ব্যক্তি বিশেষের গুণ নয়; এটি একটি সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়া। একজন প্রকৃত নেতা সংগঠিতভাবে কর্মপরিকল্পনা তৈরি ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে সমাজ বা রাষ্ট্রকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে সক্ষম হন।

এইচ. ও. ডানেল (H.O. Dunel) এর মতে, "সাধারণ লক্ষ্য অর্জনের জন্য জনগণকে সহযোগী হতে উদ্বুদ্ধ ও উদ্যোগী করার কাজকেই নেতৃত্ব বলে।"

ডব্লিউ. গোল্ডনার (W. Gouldner) বলেন, "নেতৃত্ব, ব্যক্তি বা দলের সেই নৈতিক গুণাবলি যা অন্যদের অনুপ্রেরণা দিয়ে বিশেষ দিকে ধাবিত করে"।

কিম্বল ইয়ং (Kimbal Young) এর মতে, "নেতৃত্ব হলো ব্যক্তির সেই গুণাবলি যার মাধ্যমে সে অন্যের কর্মকাণ্ডকে প্রভাবিত করে এবং অন্যদের উপর প্রভাব বিস্তার করে।"

অর্থাৎ, নেতৃত্ব হলো একটি কৌশলগত ক্ষমতা, যার মাধ্যমে নেতা নিজের আদেশ ও দিকনির্দেশনার মাধ্যমে সমাজকে পরিচালিত করেন। কার্যকর ও সৃজনশীল নেতৃত্বের মাধ্যমে একটি রাষ্ট্র উন্নয়নের সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছাতে পারে।

নেতৃত্বের শ্রেণিবিভাগ

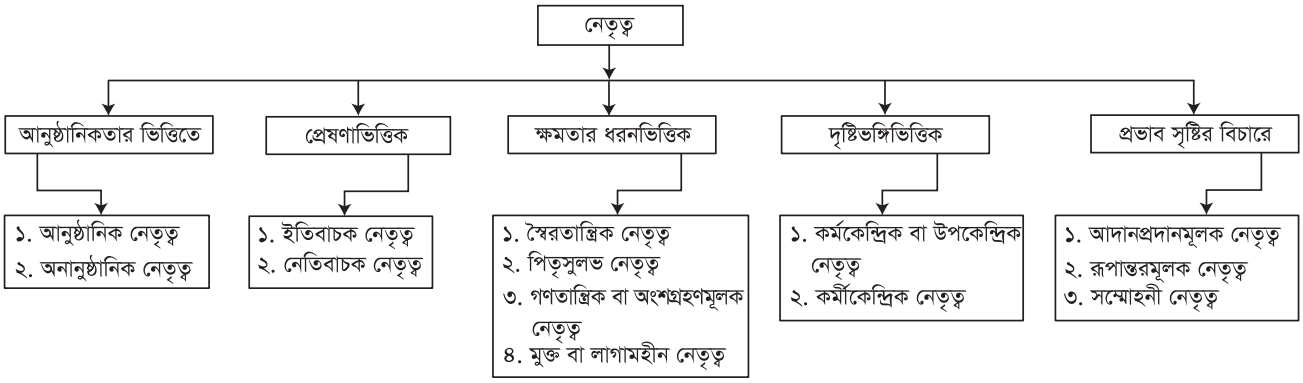

নেতৃত্বের প্রয়োজনীয় গুণাবলি

- **আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব:** নেতাকে অবশ্যই আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী হওয়া উচিত। চারিত্রিক দৃঢ়তা, মাধুর্য, তেজস্বিতা, নমনীয়তা, বাগ্মিতা প্রভৃতি গুণের মাধ্যমে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশ হয়। ব্যক্তিত্বই একজন মানুষকে নেতৃত্বের পদে অধিষ্ঠিত হতে সাহায্য করে।
- **বুদ্ধিমত্তা:** বুদ্ধিমত্তা নেতার আবশ্যকীয় গুণ। নেতা তার তীক্ষ্ণ বোধশক্তি দিয়ে সমস্যা সমাধান করে জনগণের নিকট সম্মান ও শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত হতে পারেন। নির্বোধ ও বুদ্ধিমত্তাহীন ব্যক্তি ভালো নেতা হওয়ার যোগ্যতা রাখে না।

- **শিক্ষা:** শিক্ষা মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক চেতনা বৃদ্ধি করে। যার জন্য নেতাকে নিজস্ব বিষয়ে শিক্ষা ও প্রজ্ঞার অধিকারী হতে হবে। তাকে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিষয়ে সামসময়িক ঘটনাবলি সম্পর্কে অবহিত থাকতে হয়। একজন অশিক্ষিত ব্যক্তি জনগণের ভালো নেতা হতে পারেন না।
- **মানসিক ও দৈহিক সুস্থতা:** মানসিক ও দৈহিক সুস্থতা ব্যতীত কোনো ব্যক্তি নেতা হতে পারেন না। নেতাকে অবশ্যই সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে হবে। সুস্বাস্থ্য ছাড়া নেতা কঠিন দায়িত্ব পালন করতে পারবে না। নেতার কর্ম দক্ষতা ও কষ্ট সহিষ্ণুতা নির্ভর করে তার মানসিক ও শারীরিক সুস্থতার উপর।
- **দূরদৃষ্টি:** দূরদৃষ্টি সম্পন্ন একজন নেতা ভবিষ্যতের সমস্যার ব্যাপারে আগে থেকে ধারণা করায় সক্ষম থাকেন। ভবিষ্যতের সমস্যার সম্ভাব্য সমাধানের ব্যাপারে তিনি চিন্তা করতে পারেন। এমন গুণাবলি সম্পন্ন নেতা যে কোনো রাষ্ট্র বা সমাজের জন্য আশীর্বাদস্বরূপ।
- **ধৈর্য ও সহনশীলতা:** নেতাকে অবশ্যই ধৈর্য ও সহনশীল হতে হয়। যে কোনো জটিল পরিস্থিতি নেতাকে ধৈর্য, সাহস ও সহনশীলতার মাধ্যমে মোকাবিলা করতে হয়।
- **দেশপ্রেম:** একডজন নেতাকে অবশ্যই দেশপ্রেমিক হতে হবে। দেশদ্রোহী কোনো কর্মকাণ্ডের সাথে তিনি যেমন সম্পৃক্ত হবেন না, তেমনি তার অনুসারীদেরকেও এধরনের কর্মকাণ্ড থেকে বিরত রেখে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করবেন।
- **দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা:** নেতাকে অনেক সময় তাৎক্ষণিক সংকট মোকাবেলার জন্য দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হয়। এধরনের সিদ্ধান্ত নিতে পারার সক্ষমতা জাতিকে সংঘাতময় পরিস্থিতি থেকে রক্ষা করতে পারে।
- **ন্যায়পরায়ণতা:** নেতাকে ন্যায়পরায়ণ হতে হবে। তিনি হবেন ন্যায়-নীতির প্রতীক। সকল শ্রেণির মানুষের কাছে তিনি সমান গ্রহণযোগ্য হবেন। তিনি হবেন উন্নত সৎ চরিত্রের অধিকারী।
- **প্রতিশ্রুতি রক্ষা:** নেতাকে অবশ্যই তার প্রদেয় প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে হবে। বিশেষ করে নির্বাচনের প্রাক্কালে জনগণের নিকট দায়বদ্ধ প্রতিশ্রুতি নেতাকে পূরণ করতে হবে। অর্থাৎ নেতাকে তার কথা ও কাজের মিল রাখতে হবে।
- **আত্মবিশ্বাসী:** নেতার অন্যতম গুণ আত্মবিশ্বাস। আত্মবিশ্বাসহীন কোনো নেতা জনগণের কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। তাই নেতাকে অবশ্যই কাজে-কর্মে আত্মবিশ্বাসী হতে হবে।

পরিশেষে বলা যায়, একটি ভালো রাষ্ট্রের জন্য একজন ভালো নেতা অত্যন্ত জরুরি। সঠিক নেতৃত্ব থাকলে পিছিয়ে পড়া যে কোনো দেশ ও জনগোষ্ঠী উন্নয়নের ধারায় অবতীর্ণ হতে পারে।

৩.৬ আমলাতন্ত্র

আমলা (Bureaucrat) বলতে সাধারণত রাষ্ট্রের প্রশাসন পরিচালনার জন্য নিযুক্ত স্থায়ী, বেতনভুক্ত ও পেশাদার সরকারি কর্মকর্তাদের বোঝায়, তারা সরকারের উচ্চপদস্থ অনির্বাচিত কর্মচারী যারা নীতিনির্ধারণ, পরামর্শ এবং আদেশ বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করেন। আমলাতন্ত্র হলো একটি সুশৃঙ্খল, স্থায়ী, বেতনভুক্ত এবং পেশাদারি প্রশাসনিক ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে সরকারের বা কোনো বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের দৈনন্দিন কার্যক্রম, নীতি নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন করা হয়। এটি অনির্বাচিত কর্মকর্তাদের দ্বারা পরিচালিত হয়, যারা পদসোপান (Hierarchy) ও নির্দিষ্ট নিয়মনীতি মেনে কাজ করেন। জার্মান সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স ওয়েবার আমলাতন্ত্রের আধুনিক তত্ত্বের জনক।

আমলাতন্ত্রের কার্যাবলি

- আইন কার্যকর করা;
- আইন প্রণয়নে সাহায্য দান;
- সরকারি নীতি নির্ধারণ;
- বিচার সংক্রান্ত কাজ;
- দৈনিক কার্যাবলি সম্পাদন;
- সরকারের নিকট জনগণের দাবি জ্ঞাপন;
- তথ্য পরিবেশন;
- পেশাগত ভারসাম্য রক্ষা।

রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের কাজের পার্থক্য-

বিষয়	রাজনৈতিক নেতৃত্ব	প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী
নির্বাচন	প্রত্যক্ষ (জনগণের দ্বারা)	পরোক্ষ (মেধার ভিত্তিতে)
মেয়াদ	নির্দিষ্ট (৫ বছর)	স্থায়ী (অবসর পর্যন্ত)
দায়বদ্ধতা	জনগণের কাছে	আইনের কাছে

রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের আদর্শগত সম্পর্কের স্বরূপ

রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও আমলাতন্ত্র সম্পর্কে হ্যারল্ড লাস্কি বলেন-

"রাজনৈতিক নেতৃত্ব লক্ষ্য নির্ধারণ করে, আর আমলাতন্ত্র সেই লক্ষ্য অর্জনের পথ তৈরি করে।"

৫.৪ বাংলাদেশের অর্থনীতির গতিধারা

স্বাধীনতা লাভের পর থেকে বাংলাদেশের অর্থনীতি বিভিন্ন চড়াই-উতরাই অতিক্রম করে এগিয়ে চলছে। অর্থনীতির বিভিন্ন সূচক ও নির্ধারকের মাধ্যমে তা তুলে ধরা হলো-

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি

২০২০-২১ সাল থেকে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৬ শতাংশের উপরে থাকলেও রপ্তানি আয়ের সংশোধিত হিসাব, শিল্প খাতের নিম্ন প্রবৃদ্ধি, জ্বালানি সংকট ও আমদানিতে বিধিনিষেধ, যুক্তরাষ্ট্রের পাল্টা শুল্ক আরোপের ফলে বৈশ্বিক বাণিজ্যের নেতিবাচক প্রভাব, অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ ঘাটতি প্রভৃতি কারণে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে জিডিপির প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৪.২২% এবং ২০২৪-২৫ অর্থবছরে জিডিপির প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৩.৪৯%। দেশের প্রবৃদ্ধির মূল চালিকাশক্তি হচ্ছে পোশাক শিল্প, প্রবাসী আয় এবং অবকাঠামো উন্নয়ন। ডলার সংকট, মূল্যস্ফীতি, বেকারত্ব, রাজনৈতিক অস্থিশীলতা, প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগের অভাব প্রভৃতি জিডিপি প্রবৃদ্ধিতে নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করে।

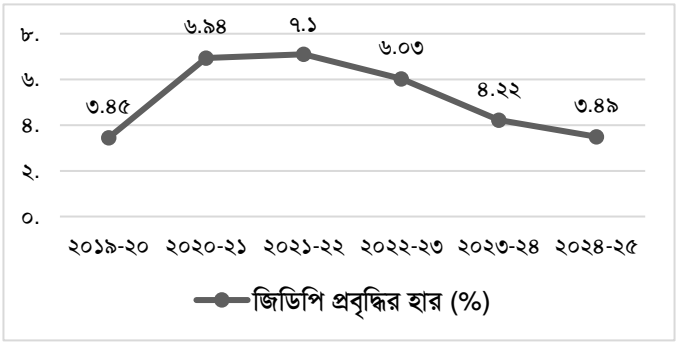

[সূত্র: ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জিডিপি'র চূড়ান্ত রিপোর্ট, বিবিএস]

মাথাপিছু আয়

বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় ২০১৯-২০ থেকে ২০২৪-২৫ পর্যন্ত অর্থবছরে ধীরে ধীরে বেড়েছে যা ২০২৪-২৫ সালে বেড়ে হয় ২৭৬৯ ডলার। ২০২০-২১ অর্থবছরে ২৭৯৩ ডলার হলেও পরবর্তীতে কিছুটা কমে। সামগ্রিক জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে ফলে মাথাপিছু আয় ধীরে ধীরে বাড়ছে যা বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশের দিকে ধাবিত করছে। এই প্রবণতা থেকে বোঝা যায়, দেশের অর্থনীতি সামগ্রিকভাবে উন্নতির পথে রয়েছে।

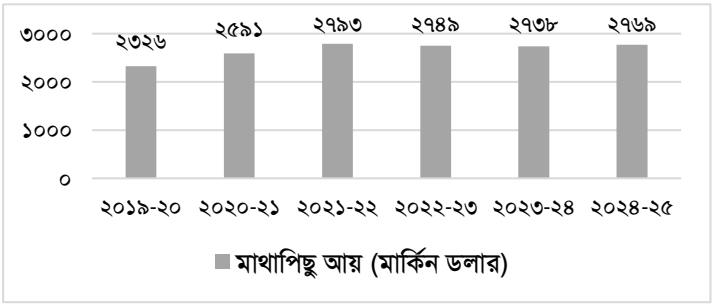

[সূত্র: ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জিডিপি'র চূড়ান্ত রিপোর্ট, বিবিএস]

সঞ্চয়

রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, প্রাকৃতিক সম্পদের অভাবের কারণে দেশে শিল্পকারখানা নির্মাণে বিভিন্ন জটিলতা রয়েছে। ফলে এখনো স্থিতিশীল মূলধন গঠন সম্ভব হয়নি। এছাড়া বাংলাদেশ মাথাপিছু আয়ের ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে উন্নতি করলেও তা আশানুরূপ নয়। আয়-বৈষম্য প্রকট হওয়ায় দেশজ ও জাতীয় সঞ্চয় কম।

অর্থবছর	দেশজ সঞ্চয়	জাতীয় সঞ্চয়
২০২২-২৩	২৫.৭৬%	২৯.৯৫%
২০২৩-২৪	২৩.৯৬%	২৮.৪২%
২০২৪-২৫	২১.৯৮%	২৭.৬৭

[সূত্র: ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জিডিপি'র চূড়ান্ত রিপোর্ট, বিবিএস]

বিনিয়োগ

২০২২-২৩ থেকে ২০২৪-২৫ এর বিনিয়োগের হার হতে লক্ষ্য করা যায় যে, ধীরে ধীরে বিনিয়োগ হ্রাস পাচ্ছে। এই বিনিয়োগ হ্রাস দেশের অর্থনীতির জন্য একটি সতর্কবার্তা হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। বৈদেশিক মুদ্রার চাপ, মূল্যস্ফীতির ঊর্ধ্বগতি, বৈশ্বিক ও অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা, এবং বেসরকারি খাতে আস্থার ঘাটতি বিনিয়োগ প্রবাহে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) 'One Stop Service' সহ বিভিন্ন পদক্ষেপ নিচ্ছে। আমলাতান্ত্রিক জটিলতা দূর হলে সামনের দিনে বিনিয়োগ বাড়বে বলে প্রত্যাশা করা যায়।

অর্থবছর	বিনিয়োগ
২০২২-২৩	৩০.৯৫%
২০২৩-২৪	৩০.৭০%
২০২৪-২৫	২৮.৫৪%

[সূত্র: ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জিডিপি'র চূড়ান্ত রিপোর্ট, বিবিএস]

মূল্যস্ফীতির হার

মূল্যস্ফীতির হার ২০২১-২২ থেকে এটি দ্রুত বাড়তে শুরু করে এবং ২০২৩-২৪ অর্থবছরে পৌঁছে যায় ৯.৭৩%-এ। বর্তমানে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে মূল্যস্ফীতির হার ১০.০৩%। এই ঊর্ধ্বগতি মূলত আন্তর্জাতিক জ্বালানি ও খাদ্যের মূল্যবৃদ্ধি, সরবরাহ শৃঙ্খলে বিঘ্ন, টাকার অবমূল্যায়ন, অতিরিক্ত অর্থ মুদ্রণ, সিন্ডিকেটের প্রভাব, প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে উৎপাদন ঘাটতি এবং চাহিদা-জোগান ভারসাম্যহীনতার কারণে ঘটে। এসব কারণে দেশে পণ্যের মূল্য বাড়ে এবং সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কমে যায়।

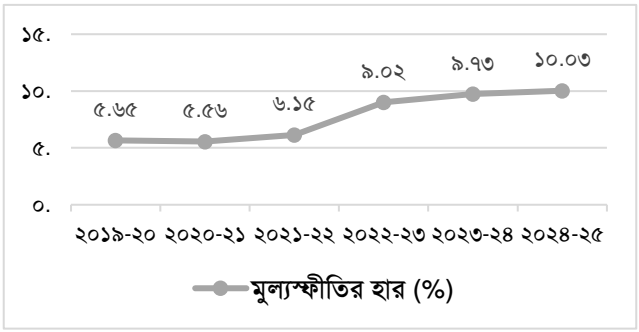

[সূত্র: ২০২৪-২৫ অর্থবছরে জিডিপি'র চূড়ান্ত রিপোর্ট, বিবিএস]

পুঁজিবাজার

২০২৪ সালের জুন পর্যন্ত ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা ছিল ৬৬০টি, যা ২০২৬ সালের মে মাসে হ্রাস পেয়ে ৬৪৫ হয়েছে। তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের মোট ইস্যুকৃত মূলধন মার্চ, ২০২৬ বাজার মূলধন ৪৬,৪৪,৬৮৮ কোটি টাকায় এসেছে। DSEX সূচকও কমে ৫২৬৫.৩৯ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে। চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে মার্চ ২০২৬-এ তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা ৬২৪টি, ইস্যুকৃত মূলধন ৬.২৯% বেড়েছে, কিন্তু বাজার মূলধন ৭.৯৯% বেড়ে ৯.০৯ লক্ষ কোটি টাকা হয়েছে। এপ্রিল ২০২৬ তারিখে সিএসই এর সার্বিক মূল্য দাঁড়িয়েছে ১৪,৬৪৬.৫২ পয়েন্টে। যদিও তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা ও ইস্যুকৃত মূলধনে কিছুটা বৃদ্ধি হয়েছে, বাজার মূলধন ও সূচকগুলোর উল্লেখযোগ্য হ্রাস পেয়ে পুঁজিবাজারে নেতিবাচক প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। এটি বিনিয়োগকারীদের মনোবল কমাতে পারে এবং বাজারের স্থিতিশীলতার জন্য সতর্কবার্তা হিসেবে কাজ করে।

আমদানি–রপ্তানি

২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাংলাদেশের মোট রপ্তানি আয় দাঁড়িয়েছে ৪৮.৩০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা আগের বছরের তুলনায় ৮.৬০ শতাংশ বেশি। যদিও কিছু পণ্যে রপ্তানি আয় বেড়েছে, বেশ কয়েকটি পণ্যে আয় হ্রাস পেয়েছে। এ তৈরি পোশাক ও নিটওয়্যার খাত রপ্তানির প্রধান উৎস হিসেবে অব্যাহত ছিল, খাতদ্বয়ের অবদান মোট রপ্তানি আয়ের ৮১.৪৬%। অপরদিকে, আমদানি ব্যয় ছিল ৬৮.৩৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা আগের বছরের তুলনায় ২.৪ শতাংশ বেশি। খাদ্যশস্য, ইলেক্ট্রনিক্স যন্ত্রপাতি ও সামরিক ক্ষেত্রে আমদানি বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশ চীন থেকে সবচেয়ে বেশি আমদানি করে থাকে।

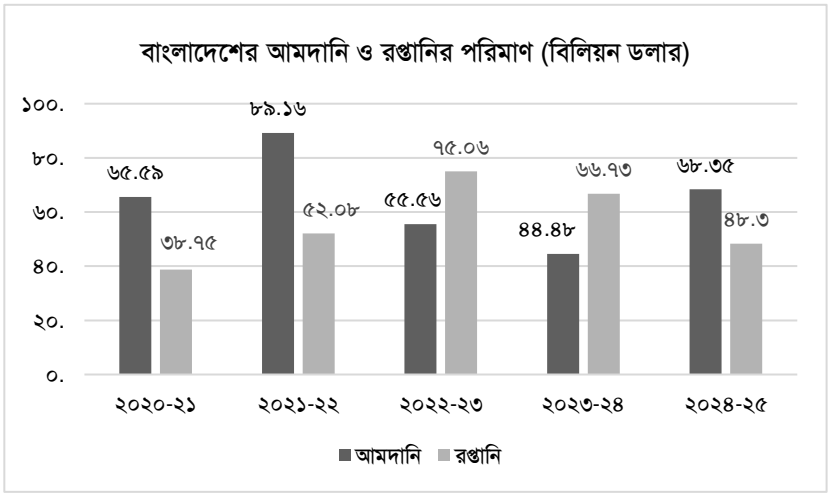

[সূত্র: অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৫]

বিনিময় ব্যবস্থাপনা

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অংশ নেওয়া প্রতিটি রাষ্ট্র ভিন্ন ভিন্ন মুদ্রা ব্যবহার করতে আগ্রহী। এ আগ্রহের কারণ হলো, নিজ মুদ্রার মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ বাজারে বিভিন্ন মাত্রায় নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা সম্ভব হয়। আন্তর্জাতিক বাজারে আবার এই মুদ্রাজনিত ভিন্নতার কারণে বিনিময় হারের সমন্বয় করতে হয়।

বিনিময় হার নির্ধারণ

বিনিময় হার বলতে আমরা দেশীয় মুদ্রার সাথে বৈদেশিক মুদ্রার মূল্যানুপাত বুঝে থাকি। যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এটা নির্ধারণ করা হয়, তাকেই বিনিময় হার নির্ধারণ পদ্ধতি বলে। বৈদেশিক মুদ্রা বাজারের ক্রেতা-বিক্রেতারা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে এটা নির্ধারণ করে থাকে। বিনিময় হার নির্ধারণের জন্য দুটি পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়- ১. স্বর্ণমান ব্যবস্থায় বিনিময় হার নির্ধারণ, ২. কাগজি মুদ্রা ব্যবস্থায় বিনিময় হার নির্ধারণ।

স্বর্ণমান ব্যবস্থায় বিনিময় হার নির্ধারণ: স্বর্ণমান ব্যবস্থা অনুসরণকারী দেশসমূহ যে পদ্ধতিতে তাদের পারস্পরিক বিনিময় হার নির্ধারণ করে তাকে বলা হয় Mint par of Exchange বা স্বর্ণমান বিনিময় হার। এই ব্যবস্থায় দুটি দেশের মুদ্রার বিনিময় হার তাদের মুদ্রা বা টাকায় স্বর্ণের অনুপাত দ্বারা নির্ধারিত হয়। বর্তমানে স্বর্ণমান ব্যবস্থাপনার প্রচলন একেবারেই কমে গেছে।

ভাসমান বিনিময় হার: যে দেশে অর্থব্যবস্থা Floating Currency নির্ভর সেখানে মুদ্রার মান স্বর্ণ বা অন্য কোনো পণ্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত থাকে না। এক্ষেত্রে বিনিময় হার দুটি পন্থায় নির্ধারিত হয়-

প্রথমটি, ক্রয় ক্ষমতার (Purchasing Power Parity) ভিত্তিতে। উদাহরণস্বরূপ ধরুন বাংলাদেশের ১২২ টাকা দিয়ে যে পরিমাণ পণ্য-সামগ্রী পাওয়া যায়। ঠিক সেই পরিমাণ পণ্য সামগ্রী যদি যুক্তরাষ্ট্রে ১ ডলারে পাওয়া যায়, তাহলে বাংলাদেশে ১২২ টাকার ক্রয় ক্ষমতা যুক্তরাষ্ট্রের ১ ডলারের ক্রয় ক্ষমতার সমান হবে। এমতাবস্থায় বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের বিনিময় হার হবে ১২২ টাকা = ১ ডলার। উভয় দেশের অভ্যন্তরীণ ক্রয়ক্ষমতা যতদিন অপরিবর্তিত থাকবে, ততদিন এই বিনিময় হারও অপরিবর্তিত থাকবে। কোনো একটি দেশের অভ্যন্তরীণ ক্রয়ক্ষমতা বা মূল্যস্তরের পরিবর্তন হলে বিনিময় হারও পরিবর্তিত হবে।

দ্বিতীয়টি, বাজারের চাহিদা ও জোগানের ভিত্তিতে। কোনো দেশের মুদ্রার চাহিদা নির্ভর করে তার রপ্তানি, বিদেশ থেকে প্রাপ্ত সাহায্য এবং ঋণ গ্রহণের উপর। অপর দিকে, একটি দেশের মুদ্রার জোগান নির্ভর করে উহার আমদানি, বৈদেশিক সাহায্য এবং ঋণদানের উপর। লেনদেনের ভারসাম্য অনুকূল হলে দেশীয় মুদ্রার চাহিদা বৈদেশিক বাজারে বৃদ্ধি পায় এবং বিনিময় মূল্যও বৃদ্ধি পায়। অপরদিকে, লেনদেনের ভারসাম্য প্রতিকূল হলে বৈদেশিক বাজারে দেশীয় মুদ্রার জোগান বৃদ্ধি পায় ও বিনিময় মূল্য হ্রাস পায়। আবার লেনদেনের ভারসাম্যে সমতা থাকলে বৈদেশিক বাজারে দেশীয় মুদ্রার চাহিদা ও জোগান সমান থাকে এবং বিনিময় হারে ভারসাম্য থাকে। আধুনিক অর্থনীতিবিদগণ বলেন বৈদেশিক বিনিময় হার লেনদেনের ভারসাম্যের উপর নির্ভর করে। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই এই তত্ত্বকে লেনদেনের ভারসাম্য তত্ত্ব (Balance of Payment Theory) বলা হয়। এটি বিনিময় হার নির্ধারণের আধুনিক তত্ত্ব হিসেবেও পরিচিত।

আস্থা বিপণন (Letter of Credit)

বৈদেশিক বাণিজ্য বা বড় লেনদেনের ক্ষেত্রে পণ্যের বিনিময়ে দেওয়া অর্থ বিক্রেতার কাছে পৌঁছাবে এই নিরাপত্তা প্রদানকে আস্থা বিপণন (Letter of Credit) বলে। সাধারণত ব্যাংক এই নিরাপত্তা প্রদান করে। অর্থাৎ বিক্রেতাকে অর্থ পরিশোধের মতো ক্রেতার কাছে যথেষ্ট সম্পদ বা ক্রেডিট রয়েছে- ব্যাংক এই নিশ্চয়তা দেয়।

বড় লেনদেন বা বৈদেশিক লেনদেনের ক্ষেত্রে আস্থা বিপণন এর প্রয়োজন হয়। ক্রেতার এলসি (LC) অর্জনের জন্য ব্যাংকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ জমা করে ক্রেডিট সংগ্রহ করতে হয়। এরপর ক্রেতা তার ক্রেডিট ব্যবহার করে পণ্য কিনতে পারে। সাধারণত ক্রেতা ব্যাংক থেকে ক্রেডিট সংগ্রহ করে, এরপর সেই ক্রেডিট দেখিয়ে পণ্য ক্রয় করে এক্ষেত্রে ক্রেতা অর্থ প্রদানে অসমর্থ হলে ব্যাংক বিক্রেতাকে প্রয়োজনীয় মূল্য পরিশোধ করে।

৭.২ বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্য

আমদানি

অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৫ অনুসারে, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাংলাদেশ ৬৬.৭৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার আমদানি খাতে খরচ করেছিল যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের মোট আমদানি ব্যয় ৭৫.০৬২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের তুলনায় ১১.১ শতাংশ কম। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী ২০২৪-২৫ অর্থবছর শেষে মোট আমদানি ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৬৮.৩৫ বিলিয়ন ডলার, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ২.৪৩ শতাংশ বেশি। চীন থেকে বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি আমদানি করে, যা মোট আমদানি ব্যয়ের শতকরা ৩০.০২ শতাংশ। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে যথাক্রমে ভারত (১৪.১৮ শতাংশ) ও যুক্তরাষ্ট্র (৩.৬৭ শতাংশ)। বিশ্বে আমদানিকারক দেশ হিসেবে বাংলাদেশ বর্তমানে ৫২তম। বাংলাদেশ মোট ১৭৩টি দেশ থেকে নানা ধরনের পণ্য আমদানি করে।

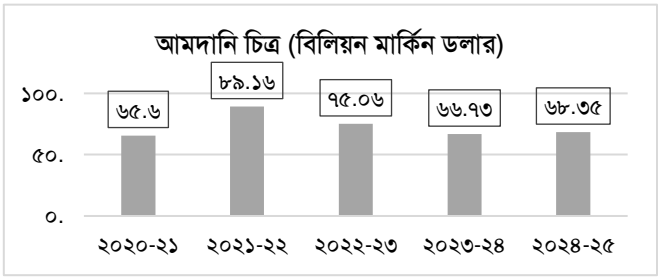

[সূত্র: অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৫]

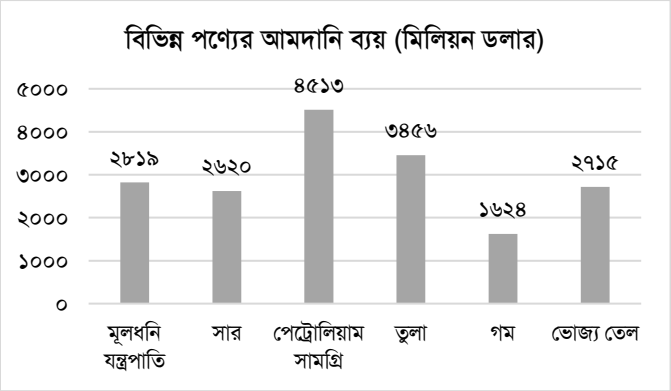

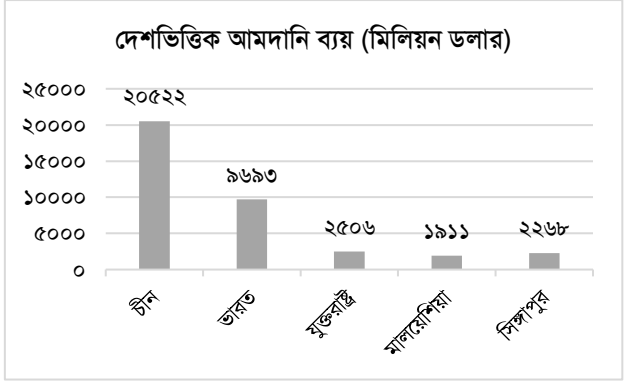

[সূত্র: অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৫]

রপ্তানি

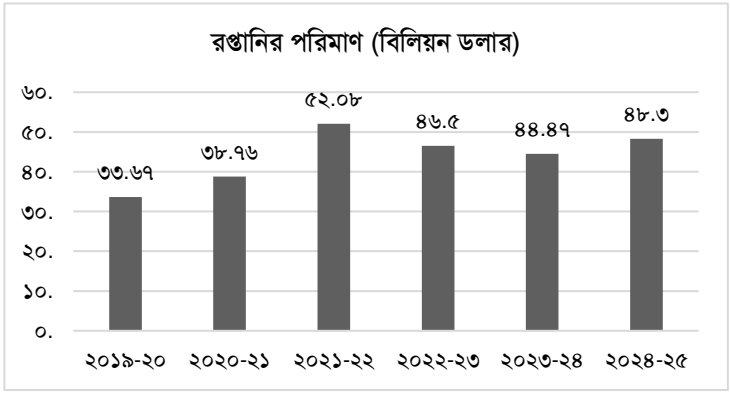

অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৫ অনুসারে, বাংলাদেশ ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৪৪.৪৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রপ্তানি বাবদ আয় করেছিল, যা পূর্ববর্তী অর্থবছর (২০২২-২৩) এর ৪৬.৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের তুলনায় ৪.৩৪ শতাংশ কম। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যানুযায়ী ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জুন মাস শেষে রপ্তানি আয় দাঁড়িয়েছে ৪৮.৩০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ৮.৬০ শতাংশ বেশি। বিশ্বে রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে বাংলাদেশ বর্তমানে ৫৫তম। বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি টাকার পণ্য রপ্তানি করে যুক্তরাষ্ট্রে, দ্বিতীয় অবস্থানে আছে জার্মানি ও তৃতীয় অবস্থানে যুক্তরাজ্য। বাংলাদেশ মোট ১৭৩টি দেশে নানা ধরনের পণ্য রপ্তানি করে। এদের মধ্যে কৃষিপণ্য রপ্তানি করে ১২১টি দেশে। আবার, বাংলাদেশ রপ্তানি করে এমন ১০টি শীর্ষ দেশের মধ্যে ইউরোপীয়ান দেশই রয়েছে ৯টি। পণ্য হিসেবে বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে তৈরি পোশাক (RMG) রপ্তানি করে। সারাবিশ্বে কাঁচাপাট রপ্তানিতে বাংলাদেশ শীর্ষে।

[সূত্র: অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৫]

২০২৪–২৫ অর্থবছরে প্রধান ১০ টি পণ্যের রপ্তানি আয়ের চিত্র

ক্রম	পণ্যের নাম	২০২৪-২৫ অর্থবছর	
		মূল্য (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	রপ্তানি আয়ের %
১	নীটওয়্যার	২১,১৬২	৪৩.৮১
২	তৈরি পোশাক	১৮,১৮৪	৩৭.৬৫
৩	কৃষিজাত পণ্য	৮৬৫	১.৭৯
৪	পাটজাত পণ্য	৭৬১	১.৫৮
৫	প্রকৌশল দ্রব্য	৫৪৬	১.১৩
৬	জুতা	৫২৩	১.০৮
৭	হিমায়িত খাদ্য	৪৪২	০.৯২
৮	রাসায়নিক দ্রব্য	৩৬৯	০.৭৬
৯	কাঁচাপাট	১৪৯	০.৩১
১০	চামড়া	১২৮	০.২৭
১১	অন্যান্য	৫,১৭১	১০.৭
	মোট	৪৮,৩০০	১০০

[সূত্র: অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৫]

২০২৪–২৫ অর্থবছরে প্রধান পাঁচটি গন্তব্যের রপ্তানি আয়ের চিত্র

ক্রম	দেশের নাম	২০২৪-২৫ অর্থবছরে রপ্তানি আয়
১	যুক্তরাষ্ট্র	৮,৬৯২.৮০
২	জার্মানি	৫,২৯৪.৪৭
৩	যুক্তরাজ্য	৪,৬২২.৬১
৪	ফ্রান্স	২,৪১৬.৮৪
৫	নেদারল্যান্ডস	২,৩৫৪.১৯

[উৎস: EPB]

রপ্তানির বৈশিষ্ট্য

- রপ্তানি বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কৃষিজাত দ্রব্য ও কাঁচামালের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। রপ্তানি পণ্যদ্রব্যও সীমিত সংখ্যক: কাঁচা পাট ও মেসতা, পাটজাত-দ্রব্য, চা, কাঁচা চামড়া, মাছ, নিউজপ্রিন্ট ইত্যাদি।
- চিংড়ি ও হিমায়িত খাদ্যদ্রব্য রপ্তানিতে প্রাধান্য পায়।
- রপ্তানি দ্রব্য সামগ্রীর দেশ সীমিত।
- প্রস্তুতকৃত পণ্য হিসেবে তৈরি পোশাক, নিটওয়্যার ইত্যাদি বর্তমানে রপ্তানি বাণিজ্যে যথেষ্ট প্রাধান্য পায়।
- মোট GDP এর অতি সামান্য আয় আসে বৈদেশিক রপ্তানি হতে।
- রপ্তানি পণ্য সংখ্যা স্বল্প।

রপ্তানি বাণিজ্যে সমস্যা

- সুষ্ঠু রপ্তানি নীতির অভাব;
- রপ্তানি পণ্যের বাজার সীমিত;
- নিম্নমানের পণ্য;
- অধিক পরিমাণে রপ্তানি শুল্ক ও বাধা আরোপ;
- কম সংখ্যক রপ্তানি পণ্য;
- সুষ্ঠু বাণিজ্যে চুক্তির অভাব;
- মূলধনের স্বল্পতা;
- দুর্বল বিপণন ব্যবস্থা।

সুপারিশসমূহ

- রপ্তানি সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি গঠন করে রপ্তানি পণ্যে বহুমুখীকরণের ব্যবস্থা নেওয়া।
- রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানসমূহকে পর্যাপ্ত ঋণ সুবিধা দেওয়া।
- পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা।
- রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো পুনর্গঠন করা।
- বিদ্যুৎ ও গ্যাসের সরবরাহ বৃদ্ধি করা।
- ট্যাক্স হলিডে ঘোষণা করা।

শুল্ক রেয়াত: রপ্তানি বাণিজ্যে উৎসাহ দানের জন্য রপ্তানিকারকদের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল আমদানির উপর আমদানি শুল্ক ও রপ্তানি পণ্য উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত কাঁচামালের উপর হতে আবগারি শুল্ক প্রত্যাহার করা হয়। এটিই শুল্ক রেয়াত।

বাণিজ্য ভারসাম্য

একটি নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত এক বছরে একটি দেশের মোট আমদানি ব্যয় ও রপ্তানি আয়ের পার্থক্যকে বাণিজ্য ভারসাম্য বলে। বাংলাদেশ বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে রপ্তানির চেয়ে আমদানি বেশি করে থাকে। ফলে বাণিজ্যিক ভারসাম্যে বাংলাদেশ সাধারণত ঘাটতিতে থাকে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাংলাদেশের বাণিজ্য ঘাটতি ছিল ২২.৪৩ বিলিয়ন ডলার, যা ২০২৪-২৫ অর্থবছরে হ্রাস পেয়ে ২০.৩৮ বিলিয়ন ডলার হয়।

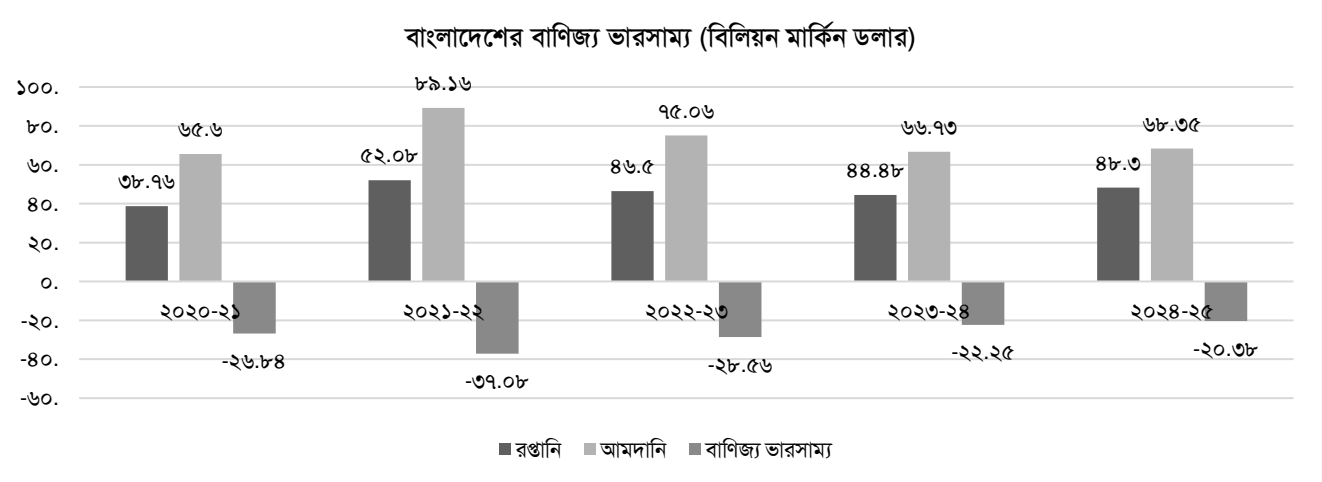

[সূত্র: অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৫]

নমুনা লিখিত প্রশ্নোত্তর

০১. প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ বলতে কী বোঝায়? বাংলাদেশের প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগের বর্তমান অবস্থা আলোচনাপূর্বক এটি বৃদ্ধিতে করণীয় পদক্ষেপসমূহ আলোচনা করুন। ২০

প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ (FDI)

FDI হলো একটি দেশে অবস্থিত একটি কোম্পানি দ্বারা অন্য দেশে অবস্থিত একটি কোম্পানিতে বিনিয়োগ। সহজ ভাষায় এফডিআই হলো এক ধরনের বিনিয়োগ যেখানে একটি ফার্ম, কোম্পানি বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান তাদের অর্থ বিদেশে বিনিয়োগ করে বা অন্য দেশে একটি ব্যাবসায়িক সত্তার মালিকানা নিয়ন্ত্রণ করে। বিদেশি সরাসরি বিনিয়োগ সাধারণত এমন দেশগুলোতে করা হয় যেখানে মুক্ত অর্থনীতি, উচ্চ প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা এবং অপেক্ষাকৃত সস্তা হারে দক্ষ শ্রমিক রয়েছে। Financial Times এর মতে, "কোনো একটি দেশের কোম্পানির অপরাপর রাষ্ট্রে মূলধন হস্তান্তর করে বাণিজ্য প্রসারিত বা নিয়ন্ত্রণ করাকে সরাসরি/প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ বলা হয়।"

বাংলাদেশে বৈদেশিক বিনিয়োগ

দেশে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অস্থিরতা, ডলার সংকট, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি, বিনিয়োগকারীদের আস্থার অভাব, ব্যাবসা সহজীকরণ সূচকে পিছিয়ে থাকা, নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বয়হীনতা, দক্ষ শ্রমিকের ঘাটতি প্রভৃতি কারণে বাংলাদেশে নেট এফডিআই প্রবাহ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। ২০২০ সালে বাংলাদেশের নেট এফডিআই ছিল ১.৪৬ বিলিয়ন ডলার, যা ২০২৪ সালে হ্রাস পেয়ে ১.২৭ বিলিয়ন ডলার হয়। ২০২৫ সালে সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ এসেছে ১.৭৭ বিলিয়ন ডলার।

[সূত্র: বাংলাদেশ ব্যাংক]

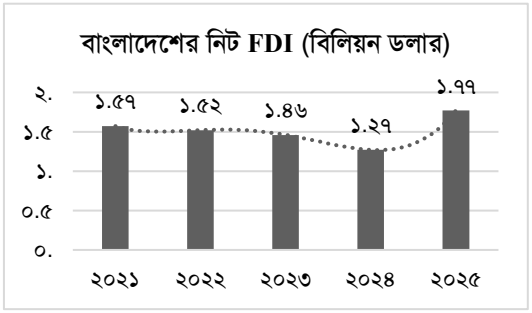

বাংলাদেশে বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে করণীয়

অবকাঠামো ও পরিষেবা উন্নয়ন

- **গ্যাস ও বিদ্যুৎ সরবরাহ:** স্পেশাল ইকোনমিক জোনসহ সকল শিল্পাঞ্চলে নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস ও বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। বিদ্যুৎ সঞ্চালনে বেসরকারি খাতকে সুযোগ দিয়ে নীতি প্রণয়ন করা যেতে পারে।
- **বন্দর ও যোগাযোগ অবকাঠামো:** বন্দর ও যোগাযোগ ব্যবস্থার ঘাটতি পূরণ করতে হবে। জাতীয় লজিস্টিক কৌশল প্রণয়ন, পরিবহণ খাতকে সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগের জন্য উন্মুক্ত করা, এবং বন্দর তদারকি ও পরিচালনায় বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ বাড়াতে হবে।
- **ডিজিটালাইজেশন:** নিবন্ধন প্রক্রিয়া ডিজিটালাইজেশন করতে হবে, যাতে বিনিয়োগকারীরা সহজে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারেন। একই ডকুমেন্ট অনলাইনে এবং হার্ডকপি জমা দেওয়ার দ্বৈততা দূর করতে হবে।

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ও আর্থিক খাত শক্তিশালীকরণ

- **রিজার্ভ বৃদ্ধি:** বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের উন্নতি না হলে বিনিয়োগ আকর্ষণ করা কঠিন। বিদেশি বিনিয়োগকারীরা যাতে সহজে তাদের ব্যাবসার মুনাফা নিজ দেশে ফেরত নিয়ে যেতে পারেন, সেই ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।
- **ব্যাংকিং সিস্টেম ও পুঁজিবাজার:** ব্যাংকিং সিস্টেম উন্নত করতে হবে এবং শেয়ারবাজারের ধস রোধে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।

নীতিগত সংস্কার ও ব্যাবসাবান্ধব পরিবেশ তৈরি

- **আইন ও নীতির ধারাবাহিকতা:** আইন ও নীতির ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করতে হবে। নীতি সহায়তা প্রাপ্তি সহজ করা এফডিআইয়ের মূল চাবিকাঠি।
- **ট্রেড লাইসেন্স ও করমুক্ত আমদানি:** ট্রেড লাইসেন্স প্রতি বছর নবায়নের বাধ্যবাধকতা সহজ করতে হবে। করমুক্ত আমদানি সুবিধার শর্তগুলো শিথিল করতে হবে।
- **ভিসা নীতি:** বিদেশি বিনিয়োগকারীদের ভিসা মেয়াদ পর্যাপ্ত করতে হবে এবং সিঙ্গেল এন্ট্রি ভিসার পরিবর্তে মাল্টিপল এন্ট্রি ভিসার সুযোগ বাড়াতে হবে, যাতে তারা অবাধে যাতায়াত করতে পারেন।
- **উদ্ভাবনী ব্যবসাকে সহযোগিতা:** উদ্ভাবনী ব্যবসাকে সব ধরনের সহযোগিতা করতে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

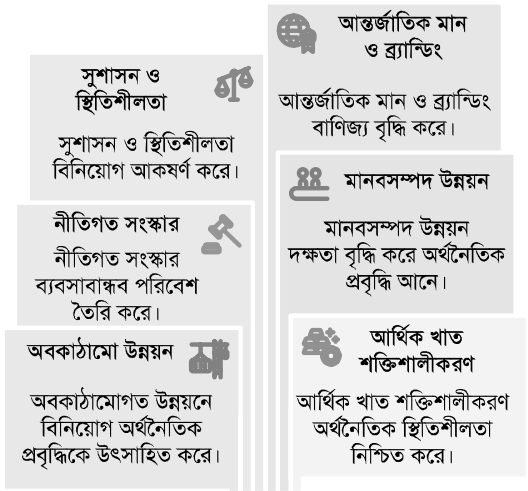

বিসিএস লিখিত নমুনা প্রশ্নপত্র

আত্রাই

বাংলাদেশ বিষয়াবলি

বিষয় কোড: ০০৫

পূর্ণমান: ২০০

নির্ধারিত সময়: ৪ ঘণ্টা

[দ্রষ্টব্য: প্রশ্নের মান প্রত্যেক প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে।]

		নম্বর
১।	বাংলাদেশের প্রধান নদ-নদীসমূহের উৎপত্তিস্থল উল্লেখপূর্বক মানচিত্রে অবস্থান দেখান। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের উপর নদীর প্রভাব আলোচনা করুন ।	২০
২।	বাংলাদেশে জনশুমারির ঐতিহাসিক পরিক্রমা লিখুন। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর অবদান বিশ্লেষণপূর্বক ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে সরকারের পদক্ষেপসমূহ আলোচনা করুন।	২০
৩।	সিপাহী বিদ্রোহের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় কারণসমূহ আলোচনা করুন। ভারতীয় উপমহাদেশের স্বাধীনতায় এ আন্দোলনের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করুন।	২০
৪।	পশ্চিম পাকিস্তানিদের নিপীড়নের বিরুদ্ধে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের প্রতিক্রিয়া এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদের উদ্ভব সম্বন্ধে আলোচনা করুন।	২০
৫।	পরিবেশ দূষণ বলতে কী বোঝায়? বাংলাদেশের প্রকৃতি ও পরিবেশ সম্পর্কিত চ্যালেঞ্জসমূহ বর্ণনা করুন। বাংলাদেশের পরিবেশ সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন এবং উহাদের প্রয়োগ সম্পর্কে মূল্যায়ন করুন।	২০
৬।	বাংলাদেশের বনভূমি সম্পর্কে লিখুন। বাংলাদেশের বনজ সম্পদের গুরুত্ব এবং বনভূমি সংরক্ষণে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ আলোচনাপূর্বক আপনার মতামত ব্যক্ত করুন।	২০
৭।	"গণতন্ত্রের সফলতার জন্য ক্ষমতাসীন দলের সহনশীলতা ও বিরোধী দলের দায়িত্বশীল ব্যবহার, উভয়ই সমান প্রয়োজন"। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আলোচনা করুন।	২০
৮।	কৃষি যান্ত্রিকীকরণ কী? বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষিখাতের অবদান আলোচনা করুন। ভবিষ্যতে বাংলাদেশের কৃষি ব্যবস্থার ধরন কী হতে পারে বলে আপনি মনে করেন?	২০
৯।	রোহিঙ্গা সংকট দীর্ঘমেয়াদে বাংলাদেশের অর্থনীতি, পরিবেশ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে কীভাবে প্রভাবিত করছে? আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে এই সংকটের টেকসই সমাধানের উপায় বিশ্লেষণ করুন।	২০
১০।	টীকা লিখুন (যেকোনো চারটি):	৪ × ৫ = ২০
	(ক) ইকো-ট্যুরিজম	
	(খ) প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা	
	(গ) সবুজ অর্থনীতি	
	(ঘ) সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি	
	(ঙ) ফ্রিল্যান্সিং ও গিগ ইকোনমি	
	(চ) জনশৃঙ্খলা রক্ষা	